গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলা থিয়েটারে বাদল সরকারের আবির্ভাব ষাটের দশকে। তখন সদ্য দেশ স্বাধীন হয়েছে। একদিকে দেশ গঠনের ব্যর্থতা আর অন্যদিকে খাদ্য, বাসস্থান আর কর্মসংস্থানের হাহাকার, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও হতাশায় নিমজ্জিত করে। ষাট থেকে সত্তর-এই দুই দশক জুড়ে বাংলায় এক ভয়ঙ্কর অস্থিরতা গ্রাস করে। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, প্রতিহিংসা, রাষ্ট্রীয় জুলুম মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সেই সময় মার্কসবাদী চিন্তা চেতনা ছাত্র থেকে যুবক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, সকল স্তরের মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। যার অনিবার্য অভিঘাত পড়েছিল তদানীন্তন বাংলার নানান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে— গল্পে, কবিতায়, গানে, চলচ্চিত্রে এবং নাটকে। সেই সময়কার মানুষের যন্ত্রণার কথা বেশ কয়েকজন নাট্যকর্মী তাঁদের নাট্য প্রযোজনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত শম্ভু মিত্রের বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী' প্রযোজনার কথাও এখানে উল্লেখ্য। ধনতন্ত্র ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মুক্তির সংগ্রাম এবং শাসক-শ্রমিকের সংঘর্ষ ও আন্দোলন 'রক্তকরবী' প্রযোজনার মধ্য দিয়ে সেদিন শম্ভু মিত্র দর্শককে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন। উৎপল দত্ত কিংবা তারও পরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁরাও তাঁদের মতো করে থিয়েটারের আরেকটা ভিন্নমুখী ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন প্রবল এই নাট্য ব্যক্তিত্বের সমান্তরালে বাংলা থিয়েটারের জগতে উঠে এলেন বাদল সরকার তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটার নিয়ে। দল গঠন, নাটক লেখা, পরিচালনা করা, তারপর আঙ্গিক-ছক তৈরি এবং অভিনয় সব ক্ষেত্রেই বাদল সরকার বাংলা থিয়েটারে এক নতুন নাট্যচিন্তার উদ্ভাবক, যা সমকাল তো বটেই বর্তমান সময়েও বহু আলোচিত বিষয়। বাদল সরকারের নাট্যকর্ম তথা তাঁর তৃতীয় ধারার থিয়েটার নিয়ে, নাট্যকর্মী বাদল সরকারকে নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। আসলে বাদল সরকার সম্পর্কে যথার্থ মূল্যায়ন না হওয়ার দরুন তাঁর সম্পর্কে একটা সরলীকরণ করা হয়। আমার এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে নাট্যকর্মী বাদল সরকার সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা কর্মটি বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে বাদল সরকারের যথার্থ স্থানটি নির্মাণ করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা রাখি।

প্রথম অধ্যায়
নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত

যে কোন শিল্পীর হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নানা ঘটনা, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত থাকে। সেইসব ঘটনা বা ঘাত প্রতিঘাত আমাদের চিনিয়ে দেয় সেই মানুষটিকে যিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে একটু একটু করে গড়ে তোলেন। একজন শিল্পী তাঁর পারিপার্শ্বিকি জীবন তথা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আবহ থেকে জীবনের পাঠ নেন। দৃশ্যত এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মধুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিক্ত অভিজ্ঞতাও। আর এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে। ছোটোবেলায় বাদল সরকার নাটক পড়তে খুব ভালোবাসতেন। যখন ইংরেজি পড়তে শিখলেন একটু-আধটু তখন নাটক দিয়ে শুরু করলেন। নাটক তাঁর প্রথম ভালোবাসা। ১/A পিয়ারি রোড-এর বাড়ির তিনতলার তাঁর বাবার পড়বার ছোট্ট ঘরটি ছিল বাদলের প্রিয়। এই ঘরেই বাদল সরকার কোনো একটা বাংলা নাটক নিয়ে একাই সব ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরোক্ষে প্রভাবিত করেছেন তখনকার দিনের ক্রিস্ট্যাল-সেট রেডিও নাটক। সে সময়কার জনপ্রিয় সাধারণ পেশাদারি মঞ্চ স্টার, রঙ্‌মহল-মিনার্ভা'র মতো মঞ্চের সফল প্রযোজনাগুলো সরাসরি রেডিওতে প্রচার হত। ফলে সেই ছাত্রাবস্থা থেকেই নাট্যজগতের বিখ্যাত সব মানুষজন যেমন শিশির ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রভাদেবী এঁদের কণ্ঠস্বর বাদলের পরিচিত ছিল রেডিওর কল্যাণে।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা হল দ্বিতীয় বীজ। পাশাপাশি থিয়েটার দেখার ছোটোখাটো কিছু অভিজ্ঞতাও পরোক্ষে থিয়েটারের প্রতি তাঁকে অনুরক্ত করেছিল। স্কুলের হস্টেলে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছোটো-খাটো নাটক হতো যা ছিল ছাত্রদের নিজস্ব অনুষ্ঠান। তখনকার মতো এইসব অভিনয় দেখা ছিল বাদল সরকারের একমাত্র সম্বল। এভাবেই তিনি আরো বেশি করে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এভাবেই থিয়েটারের বীজানুর প্রকাশ ঘটেছিল বাদল সরকারের জীবনে।

বাদল সরকারের নাট্যকর্মী হয়ে ওঠার মূলে তাঁর ক্লাস সিক্সের বাংলার শিক্ষক সরসীবাবুর প্রভাবও পরোক্ষভাবে রয়েছে। বাদল সরকার শিক্ষক সরসীবাবুর পরামর্শে একদিন লিখে ফেললেন সপ্তম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকের পিন্ডারী যুদ্ধ অবলম্বনে 'পিন্ডারীর যুদ্ধ' নাটক। নাটকে হাতেখড়ি এই প্রথম। আর একেবারে নাট্যকার, পরিচালক এবং প্রধান অভিনেতা হিসেবে বাদলের আত্মপ্রকাশ ঘটল ইংরেজি 'স্লিপার্স অফ সিন্ডারেলা' নামে একটি নাটকে। এরপর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে বাদলকে যেতে হয়, কিন্তু থিয়েটার নিয়ে, নাটক তিনি নানা ভাবনা চিন্তা করেছেন এবং

নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। আর এভাবেই একদিন নির্মাণ করেছেন স্বতন্ত্র এক থিয়েটার দর্শন। নিজেই গড়েছেন তাঁর নিজস্ব নাটকের দল 'শতাব্দী'। করেছেন অসংখ্য নাট্য ওয়ার্কশপ। একজন নাট্যকার, পরিচালক, অভিনেতা ও নাট্য সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার এই যে দীর্ঘ ইতিবৃত্ত, কীভাবে নানা ঘটনা, অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি একজন নাট্যকর্মী হয়ে উঠলেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাট্যকর্মী বাদল সরকার

নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যজীবনের প্রসেনিয়াম পর্ব সম্পর্কে এই অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁর স্বাতন্ত্র্য কোথায় এবং কীভাবে ধীরে ধীরে তিনি প্রসেনিয়াম থিয়েটারে নাট্যকর্ম শুরু করেও তাকে অতিক্রম করে থার্ড থিয়েটারে যাত্রা করলেন তা আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে এই অধ্যায়টিতে দুটি ভিন্ন শিরোনাম বিভাগ রেখে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রসেনিয়াম থিয়েটার প্রথম পর্ব

বাদল সরকারের নাট্য জীবনের আদি পর্বটি হল প্রসেনিয়াম থিয়েটার পর্ব। 'সলিউশন এক্স' (১৯৫৬) থেকে 'শেষ নেই' (১৯৭০) পর্যন্ত লিখিত নাটকগুলি এই পর্বের অন্তর্গত। প্রসেনিয়াম পর্বের নাটকগুলির মধ্যে দুই ধরণের বিষয় ও নাট্যবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে বেশ কিছু নাটক লেখা হয়েছে সিচ্যুয়েশনাল কমেডি'র আঙ্গিকে। হাসি দিয়ে, মজা দিয়ে, জীবনের যত অসম্মতি ও বাহুল্যকে নাট্যকার সামনে তুলে এনেছেন। গভীরতর জীবন ব্যঞ্জনার কথাও তিনি এই পর্বে হালকা সুরে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। 'কবিকাহিনী', 'বিচিত্রানুষ্ঠান', 'বড়ো পিসীমা', 'সলিউশন এক্স', 'শনিবার', 'রাম শ্যাম যদু', 'যদি আর একবার' প্রভৃতি নাটকগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই পর্বটিকে আমরা প্রসেনিয়াম থিয়েটার কর্মের অন্তর্গত প্রথম পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এই পর্বে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি নিছক নাটকের প্রতি, থিয়েটারের প্রতি একটা ভালো লাগার জায়গা থেকেই বাদল সরকার নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। মাধ্যমিক পড়ার সময় তাঁর মেজদির পাঠ্যবই থেকে 'স্লিপার্স অফ্ সিন্ডারেলা' নাটক লিখলেন। আর শুধু লেখাই নয়, অভিনয় করা থেকে নাট্য পরিচালন সবটাই বাদল সরকার করলেন যা তাঁর নাট্যকর্মী হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লেকচারার পদে থাকার সময় কয়েকজন

উৎসাহিকে নিয়ে তৈরি করেছেন ''Entally Novice Artistes Cultural Association'' বা 'এনাকা' গোষ্ঠী। 'এনাকা'-র গোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বাদল সরকার প্রযোজনা করেছেন সুবোধ বসুর 'অতিথি'', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লাল পাঞ্জা'। মাইথনে থাকার সময় মাইথন রিক্রিয়েশন ক্লাবের মঞ্চে অভিনয় করেছেন রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' নাটক। আবার 'চক্র' (১৯৬০) নামে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছেন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেলের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে। 'চক্র'-এর সদস্যদের সহযোগিতায় বাদল সরকার তাঁর একের পর এক উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনা করেছেন এই পর্বে। এই পর্বটিই আমরা প্রসেনিয়াম পর্বের প্রথম পর্ব হিসেবে বেছে নিয়েছি। এই পরিচ্ছেদে আমরা বাদল সরকারের নাট্য জীবনের ভিতটি অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি।

প্রসেনিয়াম থিয়েটার : দ্বিতীয় পর্ব

প্রসেনিয়াম থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্বের লিখিত নাটক এবং নাট্যায়নের মধ্যে বাদল সরকারের থিয়েটার ভাবনা ক্রমশ একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। আমরা লক্ষ করি বাদল সরকারের ব্যক্তিগত জীবনে এই সময় একটা অস্থিরতা তাঁকে গ্রাস করে। এই পর্বে লেখা 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর হতাশ, 'পাগলা ঘোড়া'-র অস্তিত্বহীনতার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বুর্জোয়া অবক্ষয় এবং বিচ্ছিন্নতা এই সময়কার বেশ কিছু নাটকে লক্ষ্য করা যায়। 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'ত্রিংশ শতাব্দী', 'বাকি ইতিহাস'', 'সারারাত্তির', 'পাগলা ঘোড়া' প্রভৃতি নাটকে ব্যক্তির হতাশা, বিচ্ছিন্নতা, অবসাদ প্রধান বর্ণিতব্য বিষয়।

এই পর্বে বাদল সরকারের নাট্যজীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী' নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। একেবারে নিজের দায়িত্বে নিজের নাট্যদল তৈরি করে নাট্য প্রযোজনা করবার প্রাথমিক সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। তাই বহুরূপীতে কাজ করার যখন সুযোগ তাঁর কাছে এলো তখন তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন বহুরূপীর সঙ্গে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বহুরূপী ত্যাগ করে তাঁর নিজস্ব নাট্যভাবনার প্রয়োগের চেষ্টা করেছেন এই পর্ব। আর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছেন থার্ড থিয়েটারের দিকে। বাদল সরকার প্রসেনিয়ামের গতানুগতিকতা স্বীকার করে নিয়েও সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। কীভাবে নাটককে আরো বেশি দর্শকের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া তার চেষ্টা করেছেন। এই পর্বান্তরের অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে পর্বে।

তৃতীয় অধ্যায়
তৃতীয় ধারার থিয়েটার

১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকেই বাদল সরকার প্রসেনিয়াম থিয়েটার মঞ্চের যে ঘেরাটোপ ও সীমাবদ্ধতা সেটিকে ভেঙে দিয়ে, সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বিকল্প থিয়েটারের সন্ধান শুরু করেন। যাকে থার্ড থিয়েটার বলা হয়। এই সময় থেকেই বাদল সরকার তাঁর নাটকের বিষয়ের পরিবর্তন ঘটাতে থাকেন এবং বুঝতে পারেন, পুরোনো নাট্যভঙ্গি দিয়ে এই পরিবর্তিত নাট্যভাবনাকে ধরা যাবে না। তাই তিনি বিষয় অনুযায়ী নাট্যাঙ্গিক বেছে নেন এবার। প্রথম দিকে 'সিচ্যুয়েশনাল কমেডি'-র মজা ও হাসি দিয়ে জীবনকে দেখার একটা চেষ্টা করতে করতে তিনি ক্রমে গভীরতর জীবনব্যঞ্জনার কথা বলেছিলেন। এবারে সেইসব প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নতুন ধরনের নাট্য প্রয়াসে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বাস্তব জগৎ তাঁকে এবার নাটকের তত্ত্বের চেয়েও জীবন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। এইখান থেকেই তাঁর নাট্যরচনার ও পরিচালনার প্রয়োগ পদ্ধতি পালটে গেল। 'শতাব্দী' নাট্যদলকে নিয়ে বাদল সরকার অঙ্গনমঞ্চের অভিনয় শুরু করলেন— ক্রমে সেখান থেকে তিনি আরও অগ্রসর হয়ে পৌঁছে গেলেন মুক্তমঞ্চের অভিনয়ের দিকে। অঙ্গনমঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চ এই হলো থার্ড থিয়েটার। থার্ড থিয়েটারের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে বাদল সরকার জানিয়েছেন- 'বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের তাগিদে তৃতীয় থিয়েটারের জন্ম। সুতরাং স্বভাবতই এই থিয়েটারের উৎস কী বলতে চাইছি, অর্থাৎ মন। তার থেকে আসছে কাকে বলতে চাইছি এবং এই দুটি থেকে আসছে কীভাবে বলব। বিষয়বস্তু তৃতীয় থিয়েটারের মূল, নতুন নাট্যশৈলী আবিষ্কার ও প্রবর্তন তৃতীয় থিয়েটারের উদ্দেশ্য নয়।' অর্থাৎ আঙ্গিক কিংবা নাট্যগঠন প্রক্রিয়া তৈরি করে নিয়ে সেই উপযোগী নাট্যবিষয় অনুসন্ধান তিনি করেননি। থার্ড থিয়েটারের মূল হচ্ছে বিষয়বস্তু । তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের তাগিদেই নাট্যাঙ্গিক নির্মাণ করে নিতে হয়েছে তাকে। 'সার্কাস' (১৯৭০) থেকে 'নদীতে' (২০০২) পর্যন্ত লিখিত নাটকগুলি বাদল সরকারের এই নতুনতর নাট্যদর্শনের নিদর্শন। এই পর্বে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাটক হলো; 'সাগিনা মাহাতো', 'স্পার্টাকুস', 'মিছিল', 'ভোমা', 'লক্ষীছাড়ার পাঁচালী', 'পাগলা ঘোড়া', 'বাকি ইতিহাস', 'সাদা-কালো' প্রভৃতি। ১৯৭১-এ 'সাগিনা মাহাতো' অভিনয়ের সময় থেকে তাঁর অঙ্গনমঞ্চ ভাবনা রূপলাভ করতে থাকে। ১৯৭২-এ ''স্পার্টাকুস' নাট্যায়নের মধ্যে দিয়ে পুরোপুরি নেমে এলেন অঙ্গনমঞ্চে। স্বভাবতই বোঝা যায়, অন্য নাটকগুলির সঙ্গে বাদল সরকারের এই পর্বের নাটকের স্পষ্টত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য যেমন প্রয়োগের দিক থেকে তেমনি নাট্যগঠন ও নির্মাণের দিক থেকেও। এইসব নাটকে থাকে না কোনো সুনির্দিষ্ট নাট্যগঠন এবং নিয়ন্ত্রিত কোনো নাট্যকাহিনি। ছোট ছোট বিভিন্ন এপিসোড তৈরি

করে সেইমতো সিচ্যুয়েশন নির্মাণ করা হয়। আর এই ছোট ছোট বৃত্তের নির্মিতির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে সমগ্র নাটকের পরিধি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের জন্য লেখা নাটক বাদল সরকারকে নাট্যকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু তাঁর যা কিছু খ্যাতি বা সাফল্য তার সবই এই বিকল্প বা থার্ড থিয়েটারের জন্য। এই পরিচ্ছেদে আমরা বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটার তথা তাঁর নাট্যভাবনার যাবতীয় বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়
সমকালীন নাট্যকর্মী ও বাদল সরকার

বাদল সরকারের সমকালে বাংলা থিয়েটার জগতে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নাট্য ব্যক্তিত্ব প্রবল জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাঁদের নাট্যকর্ম অব্যাহত রেখেছেন। শম্ভু মিত্র ও তাঁর বহুরূপী নাট্যদল সূক্ষ্ম শিল্পরস ও মানব সম্পর্কের জটিল আখ্যান তুলে ধরে প্রবলতম খ্যাতির শীর্ষে। অভিনয় ও উপস্থাপনার সর্বাঙ্গীন গুণে তিনি তাঁর নাট্যকর্মকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। অন্যদিকে উৎপল দত্ত ও তাঁর 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' নাট্যদলও নাটকের বিষয়ের বিস্তারে, ভাবনার প্রকাশে এবং উপস্থাপনার মুন্সিয়ানায় বাংলা থিয়েটারে তখন খ্যাতির শীর্ষে। শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্তের পাশাপাশি বাংলা থিয়েটারে আর এক নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'নান্দীকার' নাট্য দল এক ভিন্নমুখী ধারা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তবে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত কিংবা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও আগে বাংলা থিয়েটারের আধুনিক পথিকৃৎ বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্মও এই প্রসঙ্গে সমান আলোচ্য। এই অধ্যায়ে বাংলা থিয়েটারের এই চারজন প্রবল নাট্য ব্যক্তিত্বের নাট্যকর্মের স্বরূপ অন্বেষণের সূত্রে বাদল সরকারের নাট্যকর্মের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়
নাটককার বাদল সরকার

বাদল সরকার প্রসেনিয়াম আর অঙ্গনমঞ্চ দুটি মিলিয়ে ছোট-বড় ৫০ এর বেশি নাটক লেখেছেন। আর তার বেশিরভাগই নিজের সংস্থা 'চক্র' বা 'শতাব্দী'-র জন্য মঞ্চায়ন করেছেন। 'সলিউশন এক্স' (১৯৫৬), 'বড়ো পিসীমা' (১৯৫৯), 'শনিবার' (১৯৫১), 'কবি কাহিনী' (১৯৬৪) প্রভৃতি হাসির নাটকের পাশাপাশি সিরিয়াস নাটকও লিখেছেন। যেমন— 'এবং ইন্দ্রজিৎ' (১৯৬৩) 'বাকি ইতিহাস' (১৯৬৫), 'ত্রিংশ শতাব্দী' (১৯৬৬), 'সাগিনা মাহাতো' (১৯৭১), 'স্পার্টাকুস' (১৯৭২),

'ভোমা' (১৯৭৫) প্রভৃতি। একজন সম্পূর্ণ সমাজসচেতন মানুষ ছিলেন বাদল সরকার। নিজের বিশ্বাসের জায়গায় থেকে কোনো দিনও সরে আসেননি। সমাজের ছোট-ছোট ত্রুটি যা এক সময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে। নিজে কোন বিশেষ দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও একটা শোষণ মুক্ত সমাজের তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। আর এসবই উঠে এসেছে তাঁর লিখিত নাটকে। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর প্রধান প্রধান কয়েকটি নাটকের আলোচনাসূত্রে এই সামগ্রিক বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একই সঙ্গে তাঁর নাটকের আঙ্গিকের স্বরূপ অন্বেষণেরও চেষ্টা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
পরবর্তীকালীন নাট্যচর্চায় বাদল সরকারের প্রভাব

সমকালীন বাংলা থিয়েটারেই শুধু নয়, ভারতীয় থিয়েটারেও বাদল সরকার একটা নতুন মাত্রা দান করেছেন। প্রসেনিয়াম মঞ্চে সফল হয়েও সেখান থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে অঙ্গনমঞ্চ এবং পরে অঙ্গনমঞ্চ থেকে মুক্তমঞ্চে চলে আসেন। নির্মাণ করলেন এদেশে নতুন ধরনের এক থিয়েটার-থার্ড থিয়েটার। তাঁর প্রবর্তিত থার্ড থিয়েটারের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও। বিভিন্ন নাট্যদল বাদল সরকারের নাট্যদর্শকেই পাথেয় করে এখনও তাঁদের নাট্যচর্চার দ্বারা অব্যাহত রেখে চলেছেন। এই অধ্যায়ে নাট্যকর্মী বাদল সরকারের নাট্যচিন্তা, তথা তাঁর থিয়েটার দর্শন পরবর্তীকালীন নাট্যচর্চায় কতখানি প্রভাব ফেলেছে তা অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

উপসংহার

বাদল সরকারের নাট্যকর্ম নিয়ে একটা সময় নানা বিতর্ক হয়েছিল, এমনকি এখনও হয়। অনেকেই তাঁর নাটক এবং থিয়েটার নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার কতটা প্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নও ওঠে। এটা ঠিক যে একটা সময় পর্বে এসে বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার তার গৌরব হারিয়ে ফেলে। বিশেষ করে নব্বই-এর দশকের পর বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটার অনেকটাই বিস্মৃত হয়ে যায়। এ বঙ্গের অনেকেই উদাসীনতা দেখিয়েছেন। আমরা উপসংহারে এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বাদল সরকারের নাট্যকর্মের প্রাসঙ্গিকতা তথা তাঁর সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি।